দুর্মতি

(গল্পগ্রন্থ – উপলখণ্ড)

নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রান্তে হরিচরণ রায়ের ছোট একখানা কোঠাবাড়ি ছিল। সংসারে থাকিবার মধ্যে তাহার স্ত্রী আর এক ছেলে। হরিচরণ রায়ের বয়স বছর ত্রিশেক, স্ত্রীর বয়স একুশ-বাইশ। হরিচরণ রায়ের লেখাপড়া এমন বিশেষ কিছুই জানা ছিল না, তাহার উপর নিতান্তই পাড়াগেঁয়ে মানুষ; কাজেই কোথাও না যাইয়া তিনি বাড়ি বসিয়া পৈতৃক আমলের সামান্য একটু জমিজমার খাজনা সাধিতেন। কচু কুমড়া বেগুন—আবাদ করিতেন ঠিক বলা চলে না—পুঁতিতেন; ইহাতেই তিন প্রাণীর একপ্রকার কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিয়া যাইত।

পৌষ মাস। খুব শীত। সন্ধ্যার সময় এক দূর প্রজাবাড়ি হইতে খাজনা আদায় করিয়া হরিচরণ বাড়ি ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী বীণাপাণি উঠানের তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতেছিল, স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তুলসীতলায় প্রণাম সারিয়া, হাসিমুখে কাছে আসিয়া বলিল—তবে যে বলা হলো ফিরতে অনেক রাত হবে? আমি এখনও ডাল বাটিনি।

হরিচরণ হাতের পুঁটুলি নামাইতে নামাইতে বলিল—এলাম চলে। খাজনা তো এক পয়সাও দেবে না, মিথ্যে হয়রান হওয়া।

বীণাপাণি হাতের প্রদীপ নামাইয়া রাখিয়া বলিল—একটু দাঁড়াও, আমি কুয়ো থেকে টাটকা জল তুলে দি, তবুও একটু গরম হবে এখন। এবার যে শীত পড়ল তাতে পুকুরের জলে আর কাজ চলবে না।

হরিচরণের ছেলে নীপু বাবার গলার স্বর পাইয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাকে নিশ্চিন্তমনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে তাকের হাঁড়ি হইতে আমসত্ত্ব চুরির কাজে ব্যাপৃত ছিল। বাবার গলার স্বরে বুঝিল বিপক্ষ সজাগ হইয়াছে। সে ক্ষুণ্ণমনে বাহির হইয়া আসিয়া বাবার বড় পুঁটুলিটা দেখিয়া হঠাৎ নিজের অসাফল্যের দুঃখটা ভুলিয়া গেল। বাবাকে সে একটু ভয় করিত। হঠাৎ কাছে না আসিয়া আঙুল দিয়া পুঁটুলিটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা এতে?

হরিচরণ বলিল—হ্যাঁরে, এই বাঁদর, এই শীতে একটা কিছু গায়ে দিতে নেই তোর? ওগো, নীপুর সে দোলাইখানা কোথায় গেল?

বীণাপাণি জলের বালতি নামাইয়া বলিল—সেই বিকেলবেলা থেকে বলছি ছেলেকে, ও কি কারুর কথা শোনে! গায়ে দিয়ে দিলেও গায়ে রাখবে না। ওই তো, কাঠের আলনায় দোলাই রয়েছে।

হরিচরণ বলিল—হুঁ! সে বেতখানা কোথায় গেল?

নীপু প্রমাদ গণিয়া মা'র মুখের দিকে চাহিল। বীণাপাণি বলিল—থাক গো, আজ আর কিছু বোলো না। তারপর ছেলেকে কাছে টানিয়া বলিল—এবার ফের কিন্তু যেদিন—

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল বীণাপাণি রান্নাঘরে বসিয়া ডাল বাটিয়া কি একটা পিঠা তৈয়ারির জোগাড় করিতেছে, বাহিরের কনকনে শীত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হরিচরণ উনানের পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছে ও স্ত্রীর সহিত খোশগল্প করিয়া সমস্ত দিনের শ্রম নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। নীপু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বীণাপাণি ভুলই শুনুক কি যাই হোক, স্বামী বাহির হইয়া যাইবার সময় সে শুনিয়াছিল তাঁহার ফিরিতে রাত হইবে, কাজেই যে ডাল পূর্বে বাটা উচিত ছিল তাহা সে এখন বাটিতে বসিয়াছে। ইহার পর কখন কি হইবে? বীণাপাণি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বাটিতে লাগিল।

হরিচরণ ভাল করিয়া এক কলিকা তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—অত করেতাড়াতাড়ি করছিস কেন রে? না হয় একটু রাতই হবে এখন। এই তো সবে সন্ধ্যে, শেষে আঙুল-টাঙুল ছেঁচে ফেলবি?

নিতান্ত ঘরোয়া লোক হরিচরণের স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণের রীতি এই রকমই। অবশ্য ছেলেপিলের সম্মুখে এবং বাহিরের লোকের কাছে সম্ভাষণের অন্য রীতি আছে। এটা নির্জনের একটু গাঢ় রকমের আদরের ডাক।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—কেন? আঙুল কি রোজই ছেঁচি নাকি?

বীণাপাণি দেখিতে মন্দ নহে—রংটি খুব ফরসা না হইলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখের গড়নটি বেশ সুন্দর, চোখদুটিও ডাগর ডাগর। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-বধূ, কাজকর্মে থাকে বলিয়া শরীরেও বেশ নিটোল স্বাস্থ্য।

হরিচরণ তামাক টানিতে টানিতে বলিল—না, সত্যি বৌ, দেখ কতদিন ভাবছি,একজোড়া ভালরকম অনন্ত তোকে গড়িয়ে দেব, তা 'এই হবে, এই হবে' করে— বুঝলি না?

বীণাপাণি একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সে বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসিয়া আজ দশ বৎসর ধরিয়া এ কথা শুনিয়া আসিতেছে। একজোড়া সোনার অনন্ত গড়াইয়া দেওয়া যে তাহার দরিদ্র স্বামীর পক্ষে কতটা অসম্ভব, তাহা সে বুঝিত। স্বামীকে একটু ভুলাইবার জন্য সমদুঃখে বলিল—তা এবার তো হয়েও যেত; ওই সেটেলমেন্টের খরচা দিতেই তো অনেকটা বেরিয়ে গেল।

হরিচরণের সামান্য যাহা কিছু জমিজমা ছিল, এবার সেটেলমেন্টের খরচ বাবদ তাহার দরুন গভর্নমেন্টের লোককে ত্রিশ টাকা দিতে হইয়াছিল। সে কিন্তু স্ত্রীর কাছে ও যে-সব লোকে জমিজমার ধার ধারে না তাহাদের নিকট প্রচার করিয়া বেড়াইত যে, তাহার পৈতৃক অনেক জমি লোকে ফাঁকি দিয়া খাইত, এখন সেটেলমেন্টে সেগুলি সে ফিরিয়া পাইয়াছে, প্রায় 'শদাবধি' টাকা এজন্য তাহাকে খরচা দিতে হইয়াছে, সেটেলমেন্টের ক্যাম্পে তাহার খুব খাতির হইয়াছে ইত্যাদি। স্ত্রীর চোখে বড় হইতে সকলেই চাহে।

স্ত্রীর মুখে সেটেলমেন্টের কথা শুনিয়া হরিচরণ আরম্ভ করিল—দেখ্ সেদিন তো ক্যাম্পে গেলাম। আমাদের গাঁয়ের অনেক সব বড় বড় (হরিচরণ আঙুল দিয়া দেখাইল)—হুঁ হুঁ—ডেকে জিজ্ঞাসাও করলে না কানুনগো। আমি যেতে মাত্রই কানুনগো একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আসুন জমিদার মশায়, আসুন!' সাতবেড়ের দরুন সেই জমার যে কাগজপত্র গোলমাল হয়েছিল, বুঝলি তো—তা বলতেই কানুনগো মুহূরিদের সব বকে উঠল, বললে—'রায় মশায়, আমি না থাকলেই এরা সব গোলমাল করে ফেলে; আপনি বসুন, আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'—সে খাতির কী!

স্ত্রীর ডাগর চোখের প্রশংসমান দৃষ্টিতে উৎসাহিত হইয়া হরিচরণ অধিকতর ভিত্তিহীন কি একটা ফাঁদিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহাদের বাহিরের বাড়ির সদর দরজায় কে যেন ঘা দিতেছে শোনা গেল।

বীণাপাণি বলিল—ওগো, দরজায় কে যেন ঘা দেয়!

হরিচরণ বলিল—কই না, এত রাত্রে কে ঘা দেবে?

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আঘাতের শব্দ ও কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বীণাপাণি বলিল—ওই যে কে ডাকছে, দেখ না একবার?

হরিচরণ শঙ্কিত হইল। পূর্বেও যে আঘাতের শব্দ সে না শুনিয়াছিল এমন নহে। কিন্তু এই শুনিতে না পাওয়ার ভান করিবার মূলে একটু প্রত্নতত্ত্ব নিহিত আছে। আজ তিন বৎসর পূর্বে ঠিক এই পৌষ মাসেই সে রামনারায়ণপুরের হাটে এক কাবুলী আলোয়ান বিক্রেতার নিকট ধারে দশ টাকা মূল্যের একটা আলোয়ান খরিদ করিয়াছিল। হতভাগ্য কাবুলীওয়ালা দুইবৎসর যাবৎ হাঁটাহাঁটি করিয়াও এপর্যন্ত টাকা পাওয়া তোদূরের কথা, হরিচরণের সাক্ষাৎ পর্যন্ত পায় নাই। হরিচরণ শঙ্কিত চিত্তে সামনের উঠানে গেল। সেই কাবুলীওয়ালাটা এত রাত্রে আসে নাই তো!—বিচিত্র কি! সঙ্গে কি সে তাহার দুই একজন দেশভ্রাতাদের আনিয়াছে? তাহা হইলে উপায়?

সন্তর্পণে বাহির-বাটীর দরজার নিকট যাইতে যাইতে হরিচরণ শুনিতে পাইল দরজার বাহির হইতে বাংলায় কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—'রায় মশায় কি বাড়ি আছেন?'যাক বাঁচা গেল। তাহা হইলে কাবুলীওয়ালাটা নয়!

হরিচরণ খিল খুলিয়া দিল। দেখিল বাহিরে একজন অপরিচিত ভদ্রবেশী প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া।

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটেই কি হরিচরণ রায় মশায়ের বাড়ি?

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে আমারই নাম।

প্রৌঢ় বলিলেন—তা বেশ। বড় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আসছি কলকাতা থেকে—এই ট্রেনেই আসছি। তোমার শ্বশুর রামজীবনবাবু আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর ওখানে একসময় আমার খুব যাতায়াত ছিল। তবে এখন আমিও বাইরে বাইরে থাকি, এই জন্যে ততটা আর—। তা বেশ বেশ, বড় সন্তুষ্ট হলাম বাবাজীবনকে দেখে। বীণা এখানেই আছে তো?

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আসুন বাড়ির মধ্যে।

মুখে অভ্যর্থনা করিলেও মনে মনে সে অত্যন্ত চটিয়া গেল। দিব্য শীতের রাত্রে স্ত্রীর সহিত গল্প জমাইয়া আনিয়াছিল, তা নয়, এখন আবার রাঁধ ভাত, নিয়ে এস জলখাবার—কোথায়ই বা পিঠা, আর কোথায় বা কি! শ্বশুরগিরি ফলাবার আর সময় পেলেন না। এর চেয়ে সে কাবুলিওয়ালাও যে ছিল ভাল। নাঃ—এই সব দুর্বৃত্তের জন্য দুনিয়ায় আর সুখশান্তি নাই।

প্রৌঢ় বলিলেন—বাবাজি, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার হরিহরাত্মা ছিল। আমার নাম শুনেছ কিনা জানি না—আমার নাম কৃষ্ণলাল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব—তার ছেলেপিলে সব আমার কোলেপিঠে মানুষ। তোমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি লাহোরে চাকরি করি, কাজেই আসতে পারিনি। আহা, ছোকরা অল্প বয়সেই মারা গেল, সবই ভবিতব্য।

হরিচরণের বাড়ির দালান ছিল নিতান্ত ছোট; পৈতৃক আমলের বাড়ি, অনেকদিন মেরামত হয় নাই। জানালার কবাট খুলিয়া পড়িয়াছে, কোনো-কোনোটি নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি দিয়া গরাদের সহিত বাঁধা। হরিচরণ কৃষ্ণলালবাবুকে দালানে একটা ছোট টুলের উপর বসাইয়া বলিল—বসুন, আমি বাড়ির মধ্যে বলি।

কৃষ্ণলালবাবু বসিয়া দেখিলেন, দালানের দরজা জানালা একটাও ভাল অবস্থায় নাই। সবগুলির ফাঁক দিয়াই হু হু করিয়া হিম আসিতেছে। বন্ধুর এ কন্যাটি সকলের ছোট, তিনটি মেয়ের বিবাহ দিবার পর সর্বস্বান্ত হইয়া তাহার বিবাহ দেন। সে যে ভাল পাত্রে পড়ে নাই তাহা তিনি জানিতেন। কৃষ্ণলালবাবু মনে মনে কষ্ট অনুভব করিলেন।

মিনিট চার-পাঁচ পরে উত্তরদিকের দরজা ঠেলিয়া বীণাপাণি দালানে প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণলালবাবু তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—এস এস, বীণু মা আমার এস। ওঃ, সেই তোর বিয়ের আগে মা—তখন আমি—

বীণাপাণি গলায় আঁচল দিয়া কৃষ্ণলালবাবুকে প্রণাম করিল। কৃষ্ণলালবাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন—এস এস, সাবিত্রী-সমান হও মা। দেখি মা বীণু মুখখানা তোর, কতদিন দেখিনি।

বীণাপাণির মাতাপিতা কেহ ছিল না। বাপের বাড়ি ভাইএরা থাকিলেও পিতার মৃত্যুর পর তাহার বড় খোঁজখবর করিত না। আজ পাঁচ-ছয় বৎসর সে বাপের বাড়ি যায় নাই বা বাপের বাড়ির কাহাকেও দেখে নাই। নির্জনে তাহার মায়ের মুখ মনে পড়িত, বাপের মুখ মনে পড়িত, শৈশবের সাথীদের মুখ মনে পড়িত, উঠানের বকুলতলায় সেঁজুতি ব্রতের কথা মনে পড়িত। তার বিরহী প্রাণটি পুকুরের ঘাটের চালতাতলায়, শত শৈশবের স্মৃতিভরা তাহাদের পাড়ার ধূলামাটির পথে পথে, সেই বকুলফুলের বুকে মুখ লুকাইয়া মনের সমস্ত দুঃখকষ্ট উজাড় করিয়া দিত—অসহ্য তৃষ্ণায়। ভাইএরা তাহার খোঁজও করে না। সে ভাবিত, আজ মা-বাপ বাঁচিয়া থাকিলে কি তাহাকে এরূপ করিয়া ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন? হাজার হউক মেয়েমানুষ—অনেক দিন পরে পিতৃসম পিতৃবন্ধুকে পাইয়া তাহার সেই অভিমানই সকলের চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। ডাগর চক্ষু-দুটি ছাপাইয়া চোখের জল ঝরঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কৃষ্ণলালবাবু তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—ছিঃ, বীণু, মা আমার—কেঁদো না। কাঁদে কি মা, ছিঃ।

বীণাপাণি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—এতদিন কোথায় ছিলেন জেঠামশায়?

—আমি তো লাহোরে ছিলাম অনেকদিন। তারপরে দেশে এসে সব শুনলাম। তোর বিয়ের সময়ও আমি চিঠি পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আসতে পারলাম না। বড় জরুরি কাজ পড়ে গেল। এই তো সেদিনকার কথা—

—নরুদা ভাল আছে জেঠামশায়?

—নরু ভাল আছে, পড়ছে। এবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে।

—আমার কথা বলে নরুদা?

—বলে না মা! খুব বলে। তার নিজের বোন নেই, তোকেই বোনের মত ছেলেবেলা থেকে জানে। ছেলেবেলা খেলা হতে হতে তুই একবার ঝগড়া করে নরুর মুখ আঁচড়ে দিয়েছিলি, তোর মনে আছে বীণু?

বীণাপাণি একটুখানি হাসিল; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শৈশবের সাথী নরুদার কথা মনে পড়ায় তার চোখের পাতা পুনর্বার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বলিল—নরুদা আমায় একবারটি দেখতে আসে না কেন জেঠামশায়?আপনি গিয়ে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—দেব বই কি মা, দেব। তবে এখন তো আসতে পারবেনা, এবার যে তার পরীক্ষা কিনা। বি.এ. পরীক্ষা হয়ে গেলে তখন তোকে একবার দেখে যাবে, বলে দেব।

বীণাপাণির মনে পড়িল, রাত হইয়াছে, জেঠামশায়ের আহারাদির বন্দোবস্ত তো করিতে হইবে। সে বলিল—আপনি বসুন জেঠামশায়—

কৃষ্ণলালবাবু শশব্যস্তে প্রায় চৌকি হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—শোন মা, শোন। আমার জন্যে এত রাত্রে কিছু রাঁধতে-টাধতে হবে না। আমি রাত্রে বরং—

বীণাপাণ ঘাড় বাঁকাইয়া জননীর মত শাসনের সুরে বলিল—আচ্ছা সে হবে, বসুন জেঠামশায়। আমি সে বুঝব।

কৃষ্ণলালবাবু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বীণাপাণির বড় ইচ্ছা হইল জেঠামশায়কে শীতের রাত্রে গরম গরম লুচি ভাজিয়া খাওয়ায়। কিন্তু পয়সা কই? তাহাতে এখনই তো প্রায় এক টাকা খরচ। সংসারে অসচ্ছলতা যে কতদূর তাহা তো সে জানে। সে রান্নাঘরে গিয়া দেখিল স্বামী উনুনের পাড়ে বসিয়া আপনমনে তামাক টানিতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়াই হরিচরণ বলিল—তা কি, ভাত-টাত তো আবার রাঁধতে হবে?

বীণাপাণি বলিল—একটা কথা বলি, রাখবে? জেঠামশায়ের বয়স হয়েছে। আমার কাছে এসেছেন, এ সময় যদি একটু সেবা-যত্ন করতে না পারব তবে মেয়েজন্ম মিথ্যে নিয়েছিলাম। আমি ভাবছি জেঠামশায়কে খানকতক লুচি ভেজে দিই। তুমি তোমার সেটেলমেন্টের টাকা থেকে একটা টাকা নিয়ে গিয়ে বিপিনের দোকান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে এস না?—আনবে?

হরিচরণ কিছু পূর্বে স্ত্রীর নিকট যে জমিদারগিরির আস্ফালন করিয়াছিল, আসন্ন বিপদের মুখে সে কথা ভুলিয়া গেল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—তা তোআনলে ভালই হত—মানে আনা তো কিছু উচিত ছিল, কিন্তু হয়েছে কি, এই চব্বিশের মধ্যে টাকা দাখিল না করলে আবার সার্টিফিকেট জারি হবে। ওই যা জোগাড় করা আছে—তা থেকে—

বীণাপাণি উপায় ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল, বলিল—তুমি তার জন্যে ভেবো না, আমার কানের ছেঁদা ভাল হয়নি, মাকড়ি পরতে বড় ব্যথা হয়—আজই খুলে রাখতাম, —তা নীপুর জন্মবার বলে খুলিনি। তুমিওই থেকে টাকা নিয়ে যাও, কাল সকালে বরং মাকড়ি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা আর কোথাও পাব না? মাকড়ি তো সেই খুলতেই হবে?

ইহার পর আর কোনো প্রতিবাদ করা ভাল দেখায় না বলিয়া হরিচরণ বলিল—তবে একটা বাটি দাও, ঘিটা আনতে হবে। যাই দেখি—

হরিচরণ চলিয়া গেলে বীণাপাণি দালানে গিয়া দেখিল কৃষ্ণলালবাবু চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া কি সব জিনিসপত্র বাহির করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—মা বীণু, শোন, এদিকে আয়। আমার একটা সাধ তোকে পুরোতে হবে মা।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—কি জেঠামশায়?

—তুই ছেলেবেলায় আমার কাছে বসে আমার জলখাবার থেকে খাবার তুলে খেতিস তোর মনে আছে? আমি কলকাতা থেকে খাবার এনেছি ব্যাগে করে, তোকে ছেলেবেলার মত খাওয়াব বলে। আয় এখানে বোস বীণু—তোকে কতদিন খাওয়াইনি। তখন এই সব খাবার খেতে তুই খুব ভালবাসতিস তোর মনে আছে? আয় মা, এখানে বোস দিকি।

জেঠামশায়ের কথা শুনিয়া বীণাপাণির খুব আমোদ অনুভব হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, বাপ-জেঠা ভিন্ন কি কেউ মেয়েদের কষ্ট বোঝে? সে খাইতে ভালবাসে সত্য, কিন্তু সেজন্য এখানে তো কেউ কোনোদিন তাহাকে আদর করিয়া ভাল কিছু খাইতে দেয় নাই, পূর্বে তো তাহার শ্বশুরশাশুড়ি বর্তমান ছিলেন। আর জেঠামশায় আজ কলিকাতা হইতে ব্যাগে বহিয়া খাবার আনিয়াছেন তাহাকে খাওয়াইবার জন্য! শুধু যত্ন ও স্নেহ দান করিতে করিতে তার মনটি যে গৃহিণী ও জননীর প্রবীণত্বে উপনীত হইতেছিল, আজ এই প্রৌঢ়ের সংস্পর্শে তাহার সে মনটি আবার দশ বৎসরের ছোট মেয়ের মত হইয়া গেল। তাহার পর তাহার ঘুমন্ত খোকা নীপুর কথা মনে পড়িল—সেও খাবার খাইতে ভালবাসে। এ পর্যন্ত জেঠামশায় নীপুর কথা কিছু বলেন নাই, বোধ হয় তাহার কথা তিনি জানেন না—জানিলে নিশ্চয় তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নিজে বলিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল।

বীণাপাণি আসিয়া জেঠামশায়ের কাছে গিয়া বসিল। কৃষ্ণলালবাবু আহ্লাদে আত্মবিস্তৃতপ্রায় হইলেন। বাম হাতে বীণাপাণির মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে তিনি তাহাকে খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন। স্নেহ-মায়ায় তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন—মা বীণু, সেই তুই ছেলেবেলায় আমার জলখাবার থেকে জোর করে টপ টপ খাবার তুলে খেতিস, তোর মনে আছে কি? তখন তুই খুব ছোট। মা আমার কত রোগা হয়ে গিয়েছে (এ কথা সত্য নহে, কারণ বীণাপাণি পূর্বাপেক্ষা বরং সুস্থই ছিল)—আজ যদি রাম থাকত—! এইটে খেয়ে দেখ মা, একে রাজভোগ বলে—এ তুই কখনও খাসনি, এ কলকাতা ছাড়া সব জায়গায় বড় একটা মেলে না। কেমন, ভাল নয়?

বীণাপাণির মনে হইল নীপু কখনও রাজভোগ খায় নাই। সে খাইতে খাইতে নতমুখে ঘাড় নাড়িল।

আরও কিছু খাইবার পর বীণাপাণি বলিল—জেঠামশায়, আর কত খাব?

—আচ্ছা, এই অমৃতিখানা শুধু খা। আর খাবারগুলো তুলে রেখে দে,—জামাইকে—।তারপর বলিলেন—একটু দাঁড়া, এই দেখ্ দিকি, এই ব্রেসলেট-জোড়াটা তোর জন্যে গড়িয়েছি মা, দেখ্ দিকি, হাতে হবে তো?

কৃষ্ণলালবাবুর নিজের মেয়ে ছিল না। বন্ধুকন্যাকে শৈশব হইতেই তিনি নিজের কন্যার ন্যায় দেখিতেন। বহুদিন দেশে আসেন নাই—বিদেশ হইতে দেশে আসিবার সময়প্রথমেই তাঁহার বীণাপাণির কথা মনে পড়িল। প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া দিল্লিতে তিনি বীণার জন্য এই ব্রেসলেট-জোড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলালবাবু ব্রেসলেট-জোড়াটি বীণাপাণিকে দেখাইবার জন্য প্রদীপের সম্মুখে ধরিলেন। ক্ষীণ আলোয় তাহার চারিদিকের পাথরগুলি ঝক ঝক করিয়া উঠিল।

বীণাপাণি ব্রেসলেট দেখিয়া শুধু আশ্চর্য নয়, মুগ্ধ হইয়া গেল; সে এরূপ জিনিসকখনও দেখে নাই। ওগুলি কি জ্বলিতেছে, পাথর? পাথর ওইরকম জ্বলে নাকি?—ওমা! বিস্ময়ে তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—দেখি মা, তোর হাত?

বীণাপাণির হাতের সবুজ ও লাল রঙের জারমানি কাঁচের চুড়িগুলোকে বিদ্রূপ করিয়া ব্রেসলেটের দামী চুনি, পান্না, হীরা-জহরতগুলি যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রদীপের আলোক শতভাগে ভাগ করিয়া ব্রেসলেট-জোড়া বীণাপাণির হাতে যেন লাল সবুজ নীল আগুনের ফুলকি উড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল।

বীণাপাণি নিজের হাতের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চোখ ফিরাইতে পারিল না। গহনা আবার এ রকম হয় নাকি?

কৃষ্ণলালবাবু বীণাপাণির ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, যে গহনাটি তাহার পক্ষে অপ্রত্যাশিতরূপে সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত খুশি হইলেন। আহা, গরিবের ঘরে পড়িয়া মেয়েটা কত কষ্টই পাইতেছে, তবু এ বুড়া তো তাহাকে একটু আনন্দ দিতে পারিল।

এই সময় হরিচরণ দোকান হইতে ফিরিল। দালানের বাহিরে তাহার আসিবার শব্দ শুনিয়া বীণাপাণি দালান হইতে সরিয়া গেল। একটু পরে সে যখন রান্নাঘরে লুচি ভাজিতে বসিয়াছে, হরিচরণ সেখানে আসিলে বীণাপাণি হাসিতে হাসিতে বলিল—আজ কি দেখাব বল দিকি?

কৃষ্ণলালবাবু হরিচরণকে গহনার সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই, কারণ বলা তাঁহার পক্ষে একটু অশোভন হইত।

হরিচরণ বলিল—কি?

ব্রেসলেট পাইয়া বীণাপাণির আনন্দ আর ধরিতেছিল না। সে ব্রেসলেটটা স্বামীকে দেখাইবার জন্য কেসে পুরিয়া কেসটা রান্নাঘরে আনিয়াছিল। স্বামীর সঙ্গে একটু কৌতুক করিতে ইচ্ছা হইল, বলিল—আচ্ছা, একটুখানি চোখ বুজিয়ে থাক দিকি নি, আমি একটা ভেলকি দেখাব।

হরিচরণ বলিল—কি, শুনি?

বীণাপাণি বলিল—আচ্ছা, বোজাও না একটু চোখ, দেখাচ্ছি।

—আমি পিছন ফিরছি, কি দেখাবে দেখাও।

বীণাপাণি কেস খুলিয়া নিজের হাতে পরিল, তার পর হাসিমুখে বলিল—চেয়ে দেখ এদিকে।

হরিচরণ হঠাৎ চাহিয়া দেখিতেই যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল—কি ও?

বীণাপাণি বলিল—কি বল দেখি?

হরিচরণ নিচু হইয়া স্ত্রীর হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। সেও দরিদ্র সন্তান, এরকম জিনিস কখনও দেখে নাই—হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ ব্রেসলেটজোড়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

বীণাপাণি সকৌতুকে বলিল—কোথায় পেলাম বল দেখি?

হরিচরণ বলিল—উনি দিলেন বুঝি? দেখি—।তাহার পর ব্রেসলেটের পাথরগুলির উপর সন্দিগ্ধভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—এগুলো বোধ হয় কাঁচ। এরকম কাঁচবসানো আংটি তো দেখেছি—কলকাতা থেকে হরিগাঁয়ের মেলায় বিক্রি করতে আনে—এর দাম বেশি নয়।

বীণাপাণি বিজ্ঞ জহুরির মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল—হ্যাঁ, কাঁচ! এসব পাথর, খুব দামী পাথর।

হরিচরণ বলিল—তুই কি করে জানলি পাথর? তুই পাথর চিনিস?

বীণাপাণি মুখ হইতে বিজ্ঞতার বোঝা ভাল করিয়া না নামাইয়াই বলিল—জেঠামশায় বললেন যে।

হরিচরণ ব্রেসলেট-জোড়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিল, তারপর বলিল—তা যদি হয়, তাহলেও কিন্তু এর দাম তিনশ টাকার এক পয়সা বেশি নয়।

বীণাপাণি সন্দিগ্ধসুরে বলিল—তুমি কি করে বুঝলে? জেঠামশায় যে বললেন পাথরগুলোর দাম খুব বেশি?

হরিচরণ বলিল—ওই রকমই হবে। তিনশ' না হক, সাড়ে তিনশ-ই হলো—তার বেশি আর কত হবে! আজকাল পাথরের দাম কি! আর পাথরেই তো সব জায়গা ছেয়ে ফেলেছে, সোনা আর ওতে কতটুকু আছে!

বীণাপাণির একথা বিশ্বাস হইল না। এক জোড়া অনন্ত গড়াইতে সে শুনিয়াছে পাঁচশ টাকার বেশি পড়ে, আর এক জোড়া দামী পাথর বসানো ব্রেসলেট যে তিনশ' টাকায় হইবে, ইহা তাহার আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

রাত্রি বেশি হইবার ভয়ে বীণাপাণি খুব শীঘ্র শীঘ্র খাবার প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। তারপর জেঠামশায়কে ও স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া শুইতে গেল।

পরদিন ভোরে জেঠামশায় নীপুকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। সেদিনকার বীণু—তাহার ছেলে অত বড় হইয়াছে! সমস্ত সকাল নীপুর সঙ্গছাড়া হইলেন না; দুঃখ করিতে লাগিলেন, বীণুমার খোকা হইয়াছে জানিলে তিনি তাহার জন্য একটা চেন গড়াইয়া আনিতেন।

কলিকাতায় কৃষ্ণলালবাবুর জরুরি কাজ। দুপুরের ট্রেনে রওনা হইবার ইচ্ছা থাকিলেও, বীণাপাণির চোখের জল এড়াইতে না পারিয়া তিনি বৈকাল পর্যন্ত রহিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পুর্বে হরিচরণ তাহাকে স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

সাত-আট দিন হইয়া গেল।

বীণাপাণি ব্রেসলেট-জোড়া মাত্র বৈকালে কিছুক্ষণের জন্য পরিত, অন্য সময়ে বাসন মাজা, উঠান ঝাঁট, রান্নাবান্না করা—ইহার মধ্যে কখন সে ব্রেসলেট পরে। ব্রেসলেট-জোড়া তাহার কাছে যেন নিত্য নূতন ঠেকিত। প্রদীপের মৃদু আলোয়, নীল-লাল-সবুজ আলো যখন ব্রেসলেটের গা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িত, বীণাপাণি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুগঠিত হাত দুটিতে ব্রেসলেট-জোড়াটি বড় সুন্দর মানাইয়াছিল।

হরিচরণ একদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া বলিল—বৌ, তোর হাতে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু।

বীণাপাণির মুখ লজ্জায় ও আনন্দে রাঙা হইয়া উঠিল।

সাত-আট দিন পরে মাঘ মাসের মাঝামাঝি রায়-বাড়িতে একটা বড় নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইল। বীণাপাণির অনেক দিনের একখানা জরিপাড় কাপড় তোরঙ্গের ভিতর তোলা ছিল। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে এই কাপড়খানা সে বাহির করিয়া পরিত। হরিচরণ মুখে যতই আস্ফালন করুক, স্ত্রীকে ভাল কাপড় কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। অত্যন্ত পুরাতন হইলেও বীণাপাণি কাপড়খানাকে অতি যত্নের সহিত ব্যবহার করিত। এই নিমন্ত্রণে যাইবার সময় কাপড়খানা সে বাহির করিয়া পরিল ও মেয়েমহলে দিগ্‌বিজয়ের লোভ সামলাইতে না পারিয়া ব্রেসলেট-জোড়াও হাতে পরিয়া খাইতে গেল। তাহার ইচ্ছা নিজেকে লোকের চক্ষে বড় করা। আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষদের জ্ঞান ও বিদ্যা আছে, তাহারা লোকসমাজে তাহাই দেখাইয়া বেড়ান; কিন্তু বেচারি মেয়েদের সে সম্বল নাই, কাজেই তাহারা শুধু গহনা দেখাইয়া বড় হইতে চাহে।

সন্ধ্যার একটু পরে বীণাপাণি নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিল। একাদশীর জ্যোৎস্না অল্প অল্প উঠিয়াছে, বাড়িতে কেহ নাই—নীপুকে রায়গৃহিণী ভালবাসিতেন, রাত্রের জন্য তাহাকে রাখিয়া দিয়াছেন—সকালে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিবেন। বীণাপাণি ভাবিল স্বামী এখনও বাড়ি আসেন নাই, ততক্ষণ গা ধুইয়া ও কাপড়খানা কাচিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিবে। পুকুরের ঘাটে যাইবার সময় দেখিল, বাগানের বেড়ার ওপারে বসিয়া স্বামী কি কাজ করিতেছেন। গা হাত ধুইয়া পুকুর হইতে উঠিবার সময় সে দেখিল স্বামী বেড়ার ধারে নাই, বোধ হয় উঠিয়া বাড়ি গিয়া হাত-পা ধুইতেছেন। বাড়ি আসিয়া দেখিল, দুয়ার যেমন তেমনই তালা লাগানো আছে—স্বামী বাড়ি নাই। ভাবিল বোধ হয় পাড়ার কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন। জলের ঘড়া দালানের মুখে নামাইয়া সে ঘড়ার জলে হাত-পা ধুইয়া রকে উঠিল—কুলুঙ্গি হইতে চাবি লইয়া ঘর খুলিল, তারপর শুকনা কাপড় পরিয়া প্রদীপ জ্বালিল। জলের ঘড়া বাহির হইতে আনিয়া ভিতর হইতে দালানের দোর বন্ধ করিয়া রান্নাঘরে যাইবে,

এমন সময় তাহার ব্রেসলেটের বাক্সের কথামনে পড়িল। নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া ব্রেসলেট খুলিয়া কেস-সুদ্ধ গহনা দালানের উপর রাখিয়াছিল, তুলিয়া রাখিবার জন্য সেখানে গিয়া বীণাপাণি দেখিল—ব্রেসলেটের কেস দালানে নাই! ভাবিল, তবে কি নীচে পড়িয়া গেল? আলো ধরিয়া দেখিল, সেখানেও নাই!

বীণাপাণির মুখ ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই মনে হইল বোধ হয় স্বামী ঘরে আসিয়া জিনিসটা অসাবধানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়া থাকিবেন। তাহার নিজের তোরঙ্গের চাবি নিজের কাছে—স্বামীর নিজস্ব একটা তোরঙ ছিল, তাহার চাবি ছিল না, সেটা খুলিল, দেখিল তাহাতেও নাই। এ কুলুঙ্গি সে-কলুঙ্গি খুঁজিল, বাক্সের উপর-নীচে দেখিল, ঘরের কোণে খুঁজিল—-কোথাও নাই। গরিবের গৃহস্থালি, বাক্স-প্যাঁটরার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। যাহা ছিল তাহার কোথাও ব্রেসলেটের কেস খুঁজিয়া পাইল না। বীণাপাণি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—তাহা হইলে অন্য কেহ কি ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিল? সে কথা ভাবিতেও পারিতেছিল না—ভাবিতেই তাহার বুক কেমন আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

চুরি গিয়াছে এ কথায় আমল না দিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লগিল—তবে কি তাহার স্বামী কৌতুক দেখিবার জন্য গহনার বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছেন? নিশ্চয় তাই—নতুবা আর কে লইতে পারে?

হরিচরণের সেদিন বাড়ি ফিরিতে বেশ বিলম্ব হইল। সে কোনোদিন এত রাত করিয়া ফিরে না। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত অনেক। তাহার এক হাঁটু ধূলিকাদা, যেন অনেক রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে। হরিচরণ ঢুকিয়াই বলিল—ওঃ, আজ যা ঘোরাঘুরি হলো। সেই বেলা দুটোর সময় তুমি নেমন্তন্ন গেলেই বেরিয়েছি আর অনবরত ঘুরছি।তা তুমি এসেছ কখন?

বীণাপাণি স্বামীর কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—আহা, আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারিনি, কচি খুকি কিনা! সে তুমি বের হয়ে গেলেই আমি ধরেছি।

হরিচরণের মুখ হঠাৎ একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। একটু পরেই সে কথা বলিল বটে, কিন্তু সে যেন অনেক চেষ্টা করিয়া—কি বল দেখি? সত্যি বলছি আমি তো বাড়ি ছিলাম না। আমি সেই দুটোর সময়েই চলে গেছি খাজনা আদায় করতে। তুই কিসের কথা বলছিস?

তাহার স্বরে লেশমাত্র কৌতুকের আভাস ছিল না।

বীণাপাণি স্বামীর কথায় ও চোখমুখের ভাবে চিন্তিত হইল বলিল,—সেই ব্রেসলেটের বাক্স কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না। সন্ধ্যের আগে নেমন্তন্ন খেয়ে এসে দালানের ওপর রেখে গেলাম, তারপর ঘাট থেকে এসে দেখি আর নেই। তুমি সত্যি জান না? না, জান। সত্যি সত্যি বল লক্ষ্মীটি!

হরিচরণ লাফাইয়া উঠিল—অ্যাঁ, বল কি! ব্রেসলেটের বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না? কি সর্বনাশ? অ্যাঁ! সে যে অনেক টাকার জিনিস। আমি কি করে জানব বল, আমি তোএখানে ছিলাম না। আমি কি মিথ্যে বলছি! সেই দুটোর সময় বেরিয়ে গিয়েছি—আমি তো কিছুই জানি না।

বীণাপাণি স্বামীর কথা শুনিয়া বুদ্ধি হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—বেলা দুইটার সময় বাহির হইয়া যাওয়ার কথাটা স্বামী এত জোর করিয়া বলিতেছেন কেন? সে যে তাঁহাকে সন্ধ্যার পর বেড়ার পাশে গাবতলায় বসিয়া কঞ্চি কাটিতে দেখিয়াছে। স্বামীর আস্ফালন ও বিস্ময়ের মধ্যে একটা মিথ্যার ধ্বনি তাহার কানে আসিয়া যেন বাজিতে লাগিল।

হরিচরণ অত্যন্ত চিৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বল কি! সে তো এক-আধ টাকার জিনিস নয়; তুমিই বা সেটাকে ফেলে অমন করে যাও কেন? যাঃ—সর্বনাশ হয়ে গেল। ভাল করে ঘরদোর খুঁজেছ? চল দেখি, আমি একবার খুঁজে দেখি। ওসব মেয়েলি খোঁজার কাজ নয়—যাবে কোথায়, ঘরেই কোথাও পড়ে আছে।

বীণাপাণি দালানের মেঝেতে বসিয়া পড়িল। একটা নূতন রকমের ভয় তাহার মনের মধ্যে দেখা দিল। স্বামী মিথ্যা কথা বলিতেছে কেন? বীণাপাণি কখনও স্বামীকে অবিশ্বাস করে নাই—স্বামীর কথা এবারও সে অবিশ্বাস

করিত না, যদি সে সন্ধ্যার সময় তাহাকে না দেখিত। বুদ্ধির দিক হইতে না হইলেও তাহার নারী-হৃদয়ের অনুভূতিশক্তি কেমন করিয়া বুঝিয়া ফেলিল, স্বামী প্রতারণা করিতেছে।

তাহার ভয়টা অস্পষ্ট রকমের। কিসের জন্য এ ভয় তাহা সে বুঝিল না। ব্রেসলেট তো তুচ্ছ—তাহার জন্য এ ভয় নয়। স্বামী মিথ্যা কথা বলিতেছে কেন? তবে কি—? কথাটা সে ভাবিতেও পারিল না, কিন্তু মনের মধ্যে সেকথা স্পষ্ট ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও একটা মহাযন্ত্রণাকর অনুভূতি মনের কোন্ গোপন তল হইতে যেন ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নাই—তাহা আব্‌ছায়ার মতই অস্পষ্ট, অথচ তীক্ষ্ণ ও কঠিন—রাত্রিশেষের হিমকণার মত ঠাণ্ডা তাহার গোপন সঞ্চার।

সেই তীক্ষ্ণ শৈত্য ক্রমে ক্রমে তাহার হৃৎপিণ্ডে পৌঁছাইয়া সেখানকার উষ্ণ রক্তস্রোতকে যেন জমাট বাঁধাইয়া দিল। তাহার চোখের সামনে হরিচরণ হাঁকডাক করিয়া ঘর তোলপাড় করিতে লাগিল। বাক্সের নীচে, সিন্দুকের নীচে, চৌকির নীচে, এবং তাহা ছাড়া যত অসম্ভব স্থানে খুঁজিতে লাগিল—বীণাপাণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বামীকে কি বলিবে? একবার ভাবিল, বলে যে, সে তাহাকে সন্ধ্যার সময় ঘাটে যাইবার পথে দেখিয়াছে—কিন্তু—নাঃ, ছিঃ...

সেদিন তো বটেই, পরের দিনও কাটিয়া গেল। ব্রেসলেটের কোনো সন্ধান হইল না। হরিচরণ বলিতেছে, যে, সে থানায় গিয়া ডায়েরি করিয়া আসিয়াছে, এখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল—আর চলে না, ইত্যাদি।

শীতের সেই ঠাণ্ডা রাত্রি ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিল—ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো বিছানায় আসিয়া পড়িল। বিবাহের পর হইতে আজ পর্যন্ত যে মধুরঅনুভূতি তাহার মনের মধ্যে চিরজাগরিত ছিল, এই দুঃখে কষ্টে যাহা তাহার নীরব অবলম্বন, জানালার বাহিরের ওই ভোরের জ্যোৎস্নার মত তাহা ধীরে ধীরে মন হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। সংসারের শত অনটনেও মুখে যে হাসি তাহার চিরদিন ফুটিয়া থাকিত, এ কোন্ নিষ্ঠুর অপহারক তাহার সরল নারী-হৃদয়ের সে গোপন ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে লুটিয়া লইল! আজ দশ বৎসর ধরিয়া তিল-তিল সঞ্চয়ের সে যে অমূল্য রত্নভাণ্ডার!

গাছে গাছে পাখিরা যখন জাগিয়া উঠিয়া কলরব করিতে লাগিল, বীণাপাণি বিছানা হইতে উঠিয়া তখন বাহিরে গেল। সমস্ত রাত না ঘুমাইয়া তাহার চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশগাছের মাথা অন্যদিনের মত আজও ভোরের হিঙ্গুলরাগে রাঙা, পুকুরের পথে কচি কচি দূর্বাদলে শিশিরের জলের আলো আজও রামধনুর রঙ ফলাইয়াছে—আস-শ্যাওড়ার ঝোপের মাথায় রাঙালতার সাদা ফুলগুলি অন্যদিনের মতই নব-প্রস্ফুট; কিন্তু পৃথিবীর চেহারা এক রাতেই তাহার কাছে বদলাইয়া গেল কিসে?

সমস্ত দিন কোনো রূপে কাটিল। বীণাপাণির মুখে ব্রেসলেটের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোনো কথাই আর শোনা যায় নাই। চুপ করিয়া কলের পুতুলের মত সে সংসারের কাজ একে একে করিয়া গেল। রাত্রে শুইয়া তাহার আর ঘুম হইল না। তাহার সকল নির্ভরতা-ভরা নারীহৃদয় যেন নিষ্ঠুর আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। সেদিন ভোরে যখন হরিচরণ উঠিল তখনও বীণাপাণি শুইয়া। হরিচরণ কাজে বাহির হইয়া গেল; ফিরিল যখন, দেখিল নীপু রকে বসিয়া কাঁদিতেছে। ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিল বীণাপাণি তখনও বিছানায় শুইয়া। স্ত্রীকে গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া দেখিল তাহার গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। সংজ্ঞা নাই—জ্বরের ঘোরে অঘোর-অচৈতন্য।

হঠাৎ অনুতাপের দংশনে হরিচরণের মন তীব্র বেদনায় ভরিয়া উঠিল। সেদিন সে-ই সন্ধ্যার সময় গহনা চুরি করিয়াছিল নানাদিকে দেনা ও পাওনাদারদের জ্বালায় বিব্রত হইয়া। তাহার পূর্বে কয়েকদিন হইতেই তাহার স্ত্রীর ব্রেসলেট-জোড়াটার উপর লোভ হয়; সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকিয়াই সে দেখিল, দালানের উপর ব্রেসলেটের বাক্স। লোভ সামলাইতে না পারিয়া সেই ব্রেসলেট চুরি করিয়া রামানারায়ণপুরে এক মাড়োয়ারির দোকানে গিয়া বিক্রয় করিল মোট সাত শত টাকায়! ভাবিয়াছিল, পরে না হয় একদিন সব প্রকাশ করিবে।

স্ত্রীর মাথার কাছে গিয়া ডাকিল—বৌ, ও বৌ!

বীণাপাণি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ জবাফুলের মত লাল। হরিচরণ পাগলের মত রামহরি ডাক্তারের বাড়ি ছুটিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—জ্বরটা খুব বেশিই হয়েছে, তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই। শিশিটা পাঠিয়ে দেবেন, ওষুধ দেব।

সেইদিন বৈকাল হইতে কিন্তু বীণাপাণির অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিল। শেষবেলা হইতেই ছটফট্ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর হইতে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল—ওগো, আমায় বললে না কেন? মুক্তোর মালাছড়াটা তোমায় এমনিইপরিয়ে দিতুম—আমি তো রাখতে চাইনি—

ডাক্তার বলিলেন—আজকের রাত আর টিকবে কিনা সন্দেহ।

দশ-বারো বৎসর পরের কথা।

নীপু এখন বড় হইয়াছে। সে বেশ ভাল ছেলে হইয়া উঠিয়াছে। এইবার আই.এ. পরীক্ষা দিবে। হরিচরণের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ মেঘলতা তাহাকে নিজের ছেলের মতই বেশ আদর-যত্ন করে। এ পক্ষে হরিচরণের আরও দুই ছেলেমেয়ে হইয়াছে। গ্রামে একখানা ছোট মুদিখানার দোকান করিয়া এখন তাহার একপ্রকার ভালই চলে। শীতের সন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে অনেক সময় তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। অনেকদিন আগে রান্নাবাড়ির উঠানে বীণাপানি একটা ডালিমের চারা পুঁতিয়াছিল। শীতকালে যখন রাঙা রাঙা ফলের ভারে গাছটার ডালগুলি নুইয়া পড়ে, তখন ভাত খাইতে খাইতে সেদিকে চাহিয়া হরিচরণের গলায় ভাত বাধিয়া হঠাৎ বিষম লাগিয়া যায়। তাহার ছোট মেয়ে পুঁটি বলে—মা, তুমি তরকারিতে এত ঝাল দাও কেন? ঝালের চোটে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।